তারিখ ..29..HH..2017...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...৫......

কালের কণ্ঠ

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে স্থায়ী নীতিমালা হোক

> বর্তমানে গ্রেডিং পদ্ধতি শুধু এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাতেই চালু নেই, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়েও চালু হয়েছে। তবে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মোট মান জিপিএ ৫; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট মান জিপিএ ৪ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় মোট মান জিপিএ ৫ ধরা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু থাকা দরকার, তেমনি প্রতিবছর শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন না এনে শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে সবার দৃষ্টি রাখা জরুরি। বিশেষ করে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি

আমাদের দেশে প্রতিবছরই এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এক ধরনের চমক আসে। কখনো ফলাফলের শতকরা হারে আকাশচুম্বী প্রবণতা, আবার কখনো এর বিপরীত। জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে কিংবা শতকরা হারের এমন হেরফের কিংবা গরমিল দেখে ফলাফলের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলে। মূল্যায়ন করা হয় আগেরবার ফলাফল কেমন ছিল আর এবার কেমন হলো। মূলত আগের বছরের সঙ্গে পরের বছরের যে ফলাফলে পার্থক্য হয়, সেটির কারণ অনুসন্ধানই সবার কাছে মুখ্য হয়ে যায়। কখনো খাতা মূল্যায়নে কড়াকড়ি, কখনো শিথিলতা, কখনো নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ—এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ফলাফলে হেরফের বলে স্বীকার করে নেয় সরকারের উচ্চ মহল থেকেই। ফলাফল নিয়ে আলোচনা-সমলোচনা শেষ হতে না হতেই আরো এক দফা আলোচনা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষার সময়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়াস নতুন নয়। ঘন ঘন এসব বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষণীয়। তা ছাড়া একবার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে কড়াকড়ি আবার শিথিলতা। প্রতিবছর এমন প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন ঘটতে থাকলে এর প্রভাব যে শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ে সে বিষয়ে এরই মধ্যে আমাদের উপলব্ধি হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পরীক্ষার ফলাফল কোনো বছর সংখ্যায় বেড়ে যায় আবার কোনো বছর কমে যায়। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার গতবারের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম। আর জিপিএ ৫ও অনেক কমেছে। এ ফলাফলকে অনেকেই বাস্তবসম্মত বলে দাবি করছে। তাহলে প্রশ্ন আসে আগের বছরের ফলাফল কি অবাস্তব? আগের বছরে যারা ভালো ফল করেছে তারা কি তাহলে এ বছরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কম মেধাবী, নাকি এ বছরে যারা ভালো করেছে তারা আগের তুলনায় বেশি মেধাবী? এমন নানামুখী প্রশ্নে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলেছেন, এবার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই নিশ্চিত হওয়া যায় আগেরবারের খাতা মূল্যায়নে শিথিলতা ছিল। এতে বলাই যায় যে মন্ত্রী প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন, আগের বছরে ফলাফলধারীরা সবাই যথাযোগ্য নয়। তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যে পাস করানো হয়েছে!

আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ১৯৯১ সালে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম আমাদের দেশে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং সিস্টেমে ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরে একই পদ্ধতি ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কার্যকর করা হয়। এর আগে ফলাফল প্রদান করা হতো ডিভিশন বা বিভাগ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি এক হাজার নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বরকে প্রথম বিভাগ, ৪৫০ নম্বরকে দ্বিতীয় বিভাগ, ৩৩০ নম্বরকে তৃতীয় বিভাগ ও স্টার মার্ক নম্বরকে ৭৫০ ধরা হতো। প্রতি বিষয়ে লেটার হিসেবে ধরা হতো ৮০ নম্বরকে। যেকোনো বিষয়ে লেটার মার্ক পাওয়া খুব সহজ ছিল না। মেধাবী শিক্ষার্থী তার ফলাফলের মাধ্যমেই নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারত। অবশ্য এখন আবার গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে নম্বর জানার বিষয়টিও সংযোজিত হয়েছে। কয়েক বছর অন্তর পরীক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফলে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ একসময় (১৯৯৩-১৯৯৫ সাল) এসএসসি পরীক্ষায় নির্দিষ্টসংখ্যক এমসিকিউ অন্তর্ভুক্ত ছিল; যার কারণে শিক্ষার্থীরা ওই প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই শতভাগ এমসিকিউ প্রশ্ন কমন পাওয়ার সুযোগ ছিল। এ ক্ষেত্রে সহজেই একজন শিক্ষার্থী ভালো ফল করতে পারত। এমনকি এমসিকিউ ও রচনামূলক মিলিয়ে একত্রে পাস করলেই পাস ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এমসিকিউ পরীক্ষায় নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই শতভাগ কমন পাওয়ার নিশ্চয়তা তুলে দেওয়া হয়। পরিবর্তন আসে ফলাফলে। ফলাফল বিচারে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন কঠিন হয়ে যায়। কারণ তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার ফলাফলে পদ্ধতি পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় যখন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয় তখন জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে হঠাৎ করে জিপিএ ৫-এর পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাহলে কি আগের তুলনায় পরে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়? উল্লেখ্য, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর বছরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারা দেশে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ৭৬ জন (২০০১)। এরপর এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, কোনো বছর বেশি, আবার কোনো বছর তুলনামূলক অনেক কম। এমনভাবে প্রতিবছর অন্তর ফলাফলে পার্থক্য সৃষ্টি হলে মেধা মূল্যায়নে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বর্তমানে গ্রেডিং পদ্ধতি শুধু এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাতেই চালু নেই, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়েও চালু হয়েছে। তবে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মোট মান জিপিএ ৫; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট মান জিপিএ ৪ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় মোট মান জিপিএ ৫ ধরা হয়েছে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত জিপিএ সমান হলেও পরীক্ষাভেদে মূল্যমান সমান হয় না। কেননা কোথাও স্কেল ৫ আবার কোথাও ৪ রয়েছে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আমাদের দেশের চাকরির বিজ্ঞাপনদাতাও বিপদে কিংবা বিভ্রান্তিতে পড়েন। আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা উল্লেখ করতেও অনেক ভাবতে হয়।

কাজেই শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু থাকা দরকার, তেমনি প্রতিবছর শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন না এনে শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে সবার দৃষ্টি রাখা জরুরি। বিশেষ করে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com